কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও দেশ বাঁচাতে
১০ এপ্রিল ঢাকায় কৃষক-ক্ষেতমজুর সমাবেশ

৫ ফেব্রুয়ারি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

দেশের প্রগতিশীল ৯টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলন ৫ ফেব্রুয়ারি '১৯ মুক্তি ভবনস্থ প্রগতি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক-ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন চাষিসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনের নানা সমস্যা সংকট নিরসনের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাইফুল হক, এস.এম.এ সবুর, বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাজ্জাদ জহির চন্দন, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী ও আনোয়ার হোসেন রেজা। উপস্থিত ছিলেন মো. শাহ আলম, নিখিল দাস, জাহিদ হোসেন খান, আলমগীর হোসেন দুলাল, নিমাই গাংগুলী, জুলফিকার আলী, অর্ণব সরকার, মানবেন্দ্র দেব, লাকী আক্তার, শাহাদাৎ হোসেন খোকন, আসাদুল্লা টিটো, আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়–

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যে তিনটি খাত প্রধানত অবদান রেখে চলছে তার মধ্যে কৃষি অন্যতম। চরম বঞ্চনা ও অবহেলার পরও বর্তমানে জিডিপি'র প্রায় ১৪.৭৯ ভাগ আসে কৃষি থেকে। বাংলাদেশের মোট শ্রমজীবী মানুষ ৬ কোটি ৩৫ লাখের মধ্যে ৪২.৭ ভাগই কৃষিতে নিয়োজিত। দেশের অর্থনীতিতে একক খাত হিসেবে কৃষির অবদান এখনও সবচেয়ে বেশি। অথচ কৃষি বরাবরই শাসক সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে আসছে। তার প্রমাণ গত অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে কৃষিতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬.১০ ভাগ। চলতি অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫.৬৫ ভাগে।

এদেশের কৃষক কিনতে ঠকে আবার বেচতেও ঠকে। যে কৃষক উৎপাদন করে ১৭ কোটি মানুষের মুখের ভাত জোগায়, যাদের শ্রমে-ঘামে খাদ্য উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ; সরকার যার কৃতিত্ব দাবি করে। ১৯৭২ সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি, খাদ্য উৎপাদন হতো এক কোটি মেট্রিক টন। বর্তমানে জনসংখ্যা ১৭ কোটি, খাদ্য উৎপাদন বেড়ে হয়েছে পৌনে ৪ কোটি মেট্রিক টন। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়েছে সোয়া দুই গুণ, খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ। তারপরও কেন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকে? সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে ফসল ক্রয় না করায় সরকার ঘোষিত মূল্যেও ধানসহ ফসল বিক্রি করতে না পেরে লোকসান দেয় কৃষক। লাভবান হয় মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া ও চাতাল মালিক, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা।

এখন আলু তোলার মৌসুম চলছে। বাম্পার ফলনও হয়েছে, কিন্তু মৌসুমের শুরুতে প্রথম সপ্তাহে মণপ্রতি দাম ছিল ৪০০ টাকা, বর্তমানে কমে হয়েছে মণপ্রতি গ্রানুলা ১৪০ টাকা এবং ডায়মন্ড ২৭০ টাকা। ফলে আলু চাষিদের বিঘাপ্রতি ৮-৯ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে। তাছাড়া নেই পর্যাপ্ত সরকারি কোল্ড স্টোরেজ ও বিদেশে রপ্তানির উদ্যোগ। নেই কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা করে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ নিয়ে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলহানিতে কৃষক তাদের ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে দায়ের করা হয়েছে হয়রানীমূলক সার্টিফিকেট মামলা ও প্রায় ১২ হাজার কৃষকের নামে জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। অন্যদিকে সরকারের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে দেশের ব্যাংক

থেকে ১০ বছরে ২২ হাজার ৫০২ কোটি টাকা লুট করেছে অসৎ ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা। দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকা (অবলোপনকৃত ঋণসহ)। সেই টাকা উদ্ধারে সরকারের তেমন কার্যকর তৎপরতা নাই। একদেশে দুই আইন চলতে পারে না। খেলাপী ঋণ উদ্ধারে আইনেরও যে সংস্কার দরকার তা করা হচ্ছে না। ফলে আইনের ফাঁক গলে আদালতে আপিল-রীট করে বছরের পর বছর ঋণ পরিশোধ না করে পার পেয়ে যাচ্ছে ঋণ খেলাপীরা। এনজিও ও মহাজনী ঋণের সুদের বোঝা বইতে গিয়ে কৃষক ক্ষেতমজরেরা দিশেহারা। অনেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে এমনকি আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ নাই। ফলে ঋণে জড়িয়ে, স্থানান্তরিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে তারা। ক্ষেতমজুর-ভূমিহীনসহ গ্রামীণ শ্রমজীবীদের দীর্ঘদিনের দাবি স্বল্পমূল্যে গ্রামীণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, সে দাবি আজও উপেক্ষিত। উৎপাদনশীল কাজে জড়িত গ্রাম-শহরের শ্রমজীবিদের রেশন নাই অথচ অনুৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনীর জন্য নামমাত্র মূল্যে রেশন দেয়া হয়।

লক্ষ লক্ষ একর খাস জমি শাসকশ্রেণির বিভিন্ন দলের প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের দখলে রয়েছে। এগুলোর প্রকৃত মালিক ভূমিহীন জনতা। খাস জমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের নামে বরাদ্দ করা হচ্ছে না। জলমহালের উপরও প্রকৃত জেলেদের অধিকার নাই। দুস্থভাতা, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিএফ, ভিজিডি, টেস্টরিলিফ, বয়স্কভাতা, কর্মসৃজন প্রকল্পসহ গ্রামীণ বিভিন্ন প্রকল্পে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ। এ পরিস্থিতিতে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ দিশেহারা।

দেশে একসময় ১২ শ নদ-নদী ছিলো বলে পুরানে উল্লেখ আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী এখন মাত্র ২৩০টির অস্তিত্ব আছে। নাব্যতা হ্রাস, দখল, দূষণের শিকার হয়ে এগুলোও অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরও দেশে নৌপথ ছিল ২৬ হাজার কিলোমিটার যা কমে বর্তমানে হয়েছে মাত্র ৬ হাজার কিলোমিটার। নদীগুলোকে দখল ও দূষণমুক্ত করার জন্য মাঝে মাঝে লোক দেখানো অভিযান চালালেও এটা কানামাছি খেলার মতো; দখল উচ্ছেদের কিছুদিন পরই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে দেখা যায়। নদী খনন করে নাব্যতা রক্ষার জন্যও নেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। অথচ নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন উভয়ই সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ ও যাত্রীবান্ধব। সরকারের এদিকে কোন খেয়াল নাই।

আমাদের দেশের নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী। যার ৫৪টি ভারত থেকে ৩টি মায়ানমার থেকে এসেছে। ভারত আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লংঘন করে একতরফা বাঁধ দিয়ে উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে আমাদের নদীগুলোর নাব্যতা ও পানি প্রবাহ কমে যাচ্ছে, দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে বাড়ছে লবনাক্ততা ও জলাবদ্ধতা, মরুকরণ ঘটছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের। তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অভাব রয়েছে সরকারের। একদিকে নদ-নদীগুলো অবৈধভাবে দখল হচ্ছে, ভরাট হয়ে মরে যাচ্ছে, কারখানার বর্জ্যে দূষণের শিকার হচ্ছে, আবার বর্ষায় নদী ভাঙনে শত শত একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। সর্বশান্ত হয়ে ভিটেমাটি হারা হচ্ছে হাজার হাজার পরিবার। উদ্বাস্তু হয়ে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বস্তিতে ঝুপড়িতে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে।

দেশে বর্তমানে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ একর (৭০ লক্ষ হেক্টর)। স্বাধীনতার পর মোট কৃষি জমি ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ একর (১ কোটি হেক্টর)। সরকারের অপরিকল্পিত উন্নয়ন দর্শনে শিল্পায়ন ও হাউজিংসহ অকৃষি খাতে প্রতি বছর ১% হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে কৃষি জমি হ্রাস অব্যাহত থাকলে দেশ এক ভয়াবহ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়বে। এর অভিঘাত বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর পড়তে বাধ্য। সরকার বার বার ঘোষণা করছে কৃষি জমিতে শিল্প কারখানা হবে না অথচ এ ঘোষণার কোন বাস্তবায়ন নাই। কৃষি জমি সুরক্ষা আইনও আজপর্যন্ত প্রণয়ন হয়নি।

দেশে চিনির চাহিদা ১৬ লাখ মেট্রিক টন। আমাদের দেশের ১৫টি চিনি কলের উৎপাদন ক্ষমতা ১ লাখ ৬৮ হাজার মেট্রিক টন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি চিনিকল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং চিনি আমদানিনির্ভর হয়েছে। এর পরও যে চিনিকলগুলো চালু রয়েছে সেখানেও আখচাষিদের পাওনা পরিশোধ না করায় আখচাষিরা বিপাকে পড়েছে। শুধু জয়পুরহাট চিনি কলেই আখচাষিদের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ১৭ কোটি টাকা। আখচাষিদের এ সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয় না।

বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ উৎপাদন হয় বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার হাওর এলাকায়। প্রতি বছরই হাওরবাসী বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। প্রতি বছর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাঁধ নির্মাণের কথা থাকলেও এক্ষেত্রে দুর্নীতি, লুটপাট নিত্য সঙ্গী। ২০১৭ সালে ভয়াবহ দুর্যোগে হাওরে ফসল হানির পর সারা দেশে যখন সোচ্চার আওয়াজ উঠে হাওর সমস্যা সমাধানের তখন কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেও এখন আবার যা-তাই। এবারেও বাঁধ নিয়ে নানা অনিয়মের খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। হাওরের নদী-খাল খনন হচ্ছে না ফলে বন্যার সময় বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার দেশের জনগণের সকল অংশের মতো কৃষক-ক্ষেতমজুর তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকেও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। জনগণ ক্ষমতার মালিক এ কথা সংবিধানে লিখে রাখলেও বাস্তবে জনগণকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর '১৮ জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে এক প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে বর্তমান সরকার ক্ষমতা পুনর্বার দখলে

নিয়েছে। গ্রামীণ জীবনের সাথে যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন চাষিদের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে কৃষক-কৃষি-ক্ষেতমজুর ও দেশ বাঁচাতে দেশের কৃষক-ক্ষেতমজুরদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ভাত কাপড়ের সংগ্রামকে জোরদার করতে হবে। তাই আসুন কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও বাংলাদেশ বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হই, বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলি–

১। ধান, আলু, পাট সহ কৃষি ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত কর; প্রতি ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র চালু করে উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে ফসল ক্রয় কর। সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ কর। জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়াও।

২। ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ দাও; স্বল্পমূল্যে গ্রামীণ রেশনিং ব্যবস্থা ও ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু কর। দুস্থভাতা, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিএফ, ভিজিডি, টেস্টরিলিফ, বয়স্কভাতাসহ সকল গ্রামীণ প্রকল্পের দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বন্ধ কর।

৩। খাস জমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের নামে সমবায়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ দাও। বেকার যুবকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দাও, কর্মসংস্থান কর।

৪। ভূমি অফিস, তহসিল অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ ও ব্যাংক ঋণের দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ কর। পুলিশি হয়রানি, জুলুম, নিপীড়ন, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার বন্ধ কর।

৫। ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা ও ১২ হাজার কৃষকের নামে জারিকৃত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার কর। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদাসলে মওকুফ কর। শস্য বীমা চালু কর। এনজিও ও মহাজনি ঋণের হয়রানি বন্ধ কর।

৬। কৃষি জমি অকৃষি খাতে যাওয়া রোধ কর। কৃষি জমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন কর। আখচাষিদের রক্ষা কর, বকেয়া পাওনা পরিশোধ কর। নদী-খাল খনন কর, দখল-দূষণ বন্ধ কর, নদীভাঙন রোধে ব্যবস্থা নাও। হাওর সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নাও, হাওরের নদী-খাল খনন কর।

৭। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূর কর; লবণাক্ততা রোধে ব্যবস্থা নাও। তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় কর; বাংলাদেশকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা কর।

৮। নজির বিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধিনে দ্রুত নির্বাচন দাও; কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ দেশের জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা কর।

৯। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাও; মাতৃভাষায় শিক্ষা ও ভূমির অধিকার এবং জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।

কর্মসূচি

উল্লিখিত দাবিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ ২০১৯ দাবি পক্ষ পালিত হবে। দাবি পক্ষে প্রত্যেক জেলা-উপজেলায়, হাটসভা, পথসভা, পদযাত্রা, মিছিল অনুষ্ঠিত হবে এবং শেষ দিনে ১১ মার্চ সারা দেশে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে এবং ৯ দফাসহ কৃষি খাতে আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে ১০ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কৃষক-ক্ষেতমজুর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কর্মসূচি সফল করার জন্য সারা দেশের সংগ্রাম পরিষদ ভুক্ত শরীক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দাকোপ উপজেলার খুটাখালী বাজারে
কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ধানসহ কৃষি ফসলের লাভজনক দাম, প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি সরকারি ক্রয়কেন্দ্র চালু, সার-বীজ-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দাম কমানো, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ দেয়া ও আর্মি রেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, ১ লক্ষ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধ করা, উন্নয়ন বাজেটের ৪০ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ দেয়া প্রভৃতি দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি খুলনার দাকোপ উপজেলার খুটাখালী বাজারে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাজারের চারবান্দা মোড়ে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ দাকোপ উপজেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতি দাকোপ উপজেলার সভাপতি কিশোর রায় এবং সমাবেশ পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের দাকোপ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক প্রলয় মজুমদার। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাসদ খুলনা জেলা শাখার সমন্বয়ক জনার্দন দত্ত নান্টু, কৃষকনেতা ইয়াসিন খান, আলী আজম, অশোক সরকার, সমীরণ রায়, মৃত্যুঞ্জয় গোলদার, বিরেন্দ্র নাথ রায়, ঠাকুর দাস বিশ্বাস, সুরেশ মহাজন, ছাত্র ফ্রন্টের মুকুন্দ মণ্ডল, শুভেন্দু হাওলী ও গৌরপদ মল্লিক।